ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1016-1026
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.099

বেদান্ত আধুনিক হতাশাগ্রস্ত জীবনের মহৌষধ

ড. কৃষ্ণ ধীবর, *সহকারী আধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Since the birth of civilization, man has been plagued by three types of suffering. In family life and in personal life man today is imprisoned in the prison of threefold suffering. In the globalized world, people are constantly burned by the intense mental pressure on the one hand and physical pain on the other hand. People lose the value of life while searching for the way of liberation. Where is the relief from this frustration?

All egos of life are destroyed in Vedantic sense. When ego is destroyed, man realizes God within himself. When all the darkness of life is dispelled by the light of knowledge then the real value of life is realized. Self-confidence develops in life when all the inferiority of human life is removed by Vedic consciousness. So, it can be said that Vedanta is the elixir of liberation from all the frustrations of life. How Vedantic intuition can guide us through life's frustrations is the main object of my article.
Keyword: *Vedantic, Ego, Knowledge, Self-confidence, Consciousness, Vedanta.*

"জ্যোতির্ময়, তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।"[1]

সূর্যের প্রথম কিরণ দেহের উপর বিচ্ছুরিত হওয়ার পর থেকেই মানুষ ত্রিবিধ দু:খের যাঁতাকলে পিষছে। পিষণরত মানুষের কাতর যন্ত্রণা দার্শনিকের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে "দু:খত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা"[2] রূপে। সাংসারিক জীবনে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ আজ ত্রিবিধ যন্ত্রণার কারাগারে বন্দী। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় একদিকে প্রবল মানসিক চাপ অন্যদিকে দেহ-মনের ভাঙনে অজানা রোগ বাসা বাঁধছে শরীরের কোনায় কোনায়। আবার যে সম্পর্কের জন্য 'পথের পাঁচালী'র অপু একদিন আশ্রয় নিয়েছিল দিদির বৃষ্টিভেজা আঁচলের আড়ালে, সেই সম্পর্কের জন্য মানুষ আজ হা-পিত্যেশ করে। মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে গিয়ে মানুষ জীবনের মুল্য হারিয়ে ফেলে। জীবনযন্ত্রণার চাপে কারো ঘটছে অকালমৃত্যু আবার কেও মনের কষ্টে কাতরাতে কাতরাতে দিনরাত্রির আলো শোষণ করছেন। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। বিশ্ব আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদধন্য। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় কয়েকটি সুইচের চাপে সারা পৃথিবী আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই বিজ্ঞানের হাতছানি, ঘরের বাইরে বিজ্ঞানের মুন্সিয়ানা। জামার একটা ছোটো বোতাম থেকে শুরু করে আকাশের বুকে উড়ন্ত বিমান সবর্ত্র বিজ্ঞান উঁকি দিচ্ছে অহ:রহ। এতো পাওয়ার মাঝেও না পাওয়ার বেদনা কেন? গায়ে হতাশার গন্ধ মেখে মানুষকে কেন প্রতিদিন ছুটতে হচ্ছে রাজপথ থেকে গলিপথে? এই হতাশা থেকে মুক্তি কোথায়?

[1] 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (চতুর্থ খণ্ড), নৈবেদ্য কাব্যের ৬০সংখ্যক কবিতা, পৃষ্ঠা-২৯৪

[2] সাংখ্যকারিকা-১, পৃষ্ঠা-৪

এই প্রশ্নগুলি মনের দরজায় রেখেই যদি আমরা ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার অন্দরমহলে মন ফেরায়, যে সাধনা ভারতীয় দর্শনের উচ্চতর ভাবনার দ্বারা চিরকাল লালিত হয়েছে, তাহলে আমাদের বর্তমান জীবনে হতাশার গাঢ় অন্ধকারের আড়ালে এক বিন্দু আশার আলোর ঝলকানি দেখতে পাব। সেই আলোর শান্ত স্নিগ্ধ তাপ শোষণ করে জীবন উপলব্ধি করবে-"আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।" সেই আলোর সন্ধান দিতেই বৈদিক মননঋদ্ধ ঋষিরা সাধনায় মগ্ন হলেন। ঋষিদের সেই সাধনার ফসলী হল বেদ। আর বেদের অন্তিম পর্বে বিকশিত উপলব্ধিই হল বেদান্ত।

বৈদান্তিক উপলব্ধিতে জীবনের সকল অহংকার ধ্বংস হয়ে মানুষ নিজেকে 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' রূপে উপলব্ধি করেন। যখন জ্ঞানের আলোয় জীবনের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় তখন জীবনের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধ হয়। মানুষের জীবনের সমস্ত হীনমন্যতা বৈদান্তিক চেতনার দ্বারা দূর হলে জীবনে আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠে। তাই বলা যায় বেদান্ত জীবনের যাবতীয় হতাশা থেকে মুক্তির মহৌষধ। বৈদান্তিক অনুভূতি কিভাবে আমাদের জীবনের হতাশা কাটিয়ে মুক্তির পথ দেখাতে পারে তাই আমার পত্রের মূল উপজীব্য।

হীনমন্যতা দূরীকরণ ও আত্মবিশ্বাস গঠনে বেদান্ততত্ত্ব:

বর্তমান মানবজীবনের যাবতীয় হতাশার একটি প্রধান কারণ হল হীনমন্যতা অর্থাৎ নিজের উপর বিশ্বাস না রাখা। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় বিজ্ঞানের আশীর্বাদধন্য হয়েও আজ মানুষ প্রতিমুহূর্তে হীনমন্যতার অন্ধকারে ডুবে থাকে। বাঁচার ইচ্ছা থাকলেও কে যেন তাকে পিছন থেকে ডাক দেয়। হীনমন্যতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে জীবনের শক্তি যখন হ্রাস পেতে থাকে তখন জীবনের সমস্তকিছু ধূসর মনে হয়, কিন্তু বৈদান্তিকশক্তি হীনমন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। জীবনানন্দের ভাবনায়-

"আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে সব ব্যর্থতা।"[3]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দাঁড়িয়ে হতাশাগ্রস্ত অর্জুনকে আমরা বলতে শুনেছিলেন

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।"[4]

আবার সেই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উপদেশে আপ্লুত হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন-

"নষ্টো মোহ: স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।"[5]

সেই জন্য বলা হয় Shree krishna is the best teacher and Arjun is the best student of the world.

প্রশ্ন হল, আমরা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রায় হীনমন্যতাকে কিভাবে কাটিয়ে উঠব এবং জীবনের ব্যর্থতাকে কিভাবে সাফল্যে রূপান্তরিত করব? উত্তরে বলতে পারি, উপনিষদ্ অনুসারে জগতের প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিরাজিত- "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্।"[6] আমাদের জীবন সর্বশক্তিমান ব্রহ্মেরই অংশমাত্র, আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[7] তবে জীবনের প্রকৃত শক্তির প্রতি আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। আমরা হীনমন্যতা কাটিয়ে জীবনে গভীর আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাব। অন্তরের সেই আত্মপ্রত্যয় জীবনযুদ্ধের রণক্ষেত্রে রক্ষাকবচ রূপে উপলব্ধ হবে।

একটি গল্পের সাহায্যে বিষয়টি আলোকপাত করা যাক। এক গভীর জঙ্গলে একটি সন্তানসম্ভাবা সিংহী বাস করত। একদিন সে একদল ভেড়াকে আক্রমণ করতে তাদের পিছু হাঁটতে শুরু করল। তারপর ভেড়াগুলিও ভয় পেয়ে সামনে

---

[3] জীবনানন্দ দাশ, স্বপ্নের হাতে, পৃষ্ঠা-৮৩

[4] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১/৩১

[5] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৮/৭৩

[6] ঈশোনিষদ্-১

[7] ছান্দোগ্য উপনিষদ্

দিকে ছুটলো, তাদের চলার পথে একটি নালা উপস্থিত হল। ভেড়াগুলি লাফ দিয়ে নালাটি পেরিয়ে গেল। কিন্তু সিংহীটি লাফাতে গিয়ে একটি বাচ্চা প্রসব করে মারা গেল। তারপর সিংহের বাচ্চাটি ভেড়াদের দলে মিশে গিয়ে তাদের আচার-আচরণ অনুসরণ করতে লাগল। সেই বনে অন্য এক সিংহ সেই সিংহের বাচ্চাটিকে ডেকে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে, সে সিংহের বাচ্চা। কিন্তু দীর্ঘদিনের সংস্কারবশত: সিংহের বাচ্চাটি ভেড়াদের দলেই ফিরে গেল। তারপর আবার একদিন সিংহটি ঐ বাচ্চা সিংহটির সামনে কিছু মাংসের টুকরো রেখে দিল এবং বলল এবার তুমি সিংহের মতো গর্জন করে মাংসের টুকরোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়। কিন্তু বাচ্চা সিংহটি তা পারল না, ভেড়াদের মতো ডাক দিয়ে ঘাস খেতে শুরু করল। কিন্তু অনেকবার চেষ্টার পর সেই সিংহের বাচ্চার ভিতর থেকে আসল সিংহের ডাকটি বেরিয়ে এলো। সিংহের ডাকই হল তার আসল ডাক। সিংহের মতো মানবজীবনের আসল শক্তি তার অন্তরেই নিহিত। সচ্চিদানন্দের অংশরূপে অন্তর থেকে প্রত্যেকটি মানুষই অফুরন্ত ক্ষমতার অধিকারী। তাই উপনিষদ্ ঋষিরা উপদেশ দিয়েছিলেন-"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"[8] প্রতিটি মানুষ যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, জীবনের অভিধানে হীনমন্যতার কোনো স্থান নেই, গভীর আত্মবিশ্বাসে সে ভাণ্ডার পূর্ণ। তবে সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতিটি উপলব্ধি মানুষকে হতাশা থেকে চিরমুক্তি দেবে। সেই আধ্যাত্মিকতা রূপের নয়, অরূপের সাধনা। বেদান্তের মতে আমার মধ্যেও যদি ঈশ্বররূপী ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারি তবেই তো হীন্যমন্যতা কাটিয়ে নিজের মধ্যে সেই সাধনা করতে পারব আমরা। বিবেকানন্দের ভাষায়-"**বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন,**

> **সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম –এই: নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা ; এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না।"**[9]

নিঃস্বার্থপরতা ও বেদান্তচেতনা:

আজ ব্যস্ততার দুনিয়ায় সারা পৃথিবীর মানুষ ছুটছে সময়ের হাতঘড়িকে জীবনের সাতপাকে বেঁধে নিয়ে। আজ প্রতিদিন নূতন নূতন অভিজ্ঞতায় মানুষের দিনযাপন হয়। বিজ্ঞানের দৌলতের সারা পৃথিবী আজ তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু জীবনে এত কিছু পাওয়ার পরেও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটি মানুষ আজও অসুখী, অশান্তির কারাগারে বন্দী। মানুষের এই যাবতীয় অশান্তির প্রধান কারণ হল স্বার্থপরতা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি আমরা। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আজ ব্যস্ত তার নিজের সংসার,আত্মীয় পরিজন, নিজের ঘরবাড়ি, নিজের চাকরি, এবং ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য। যদিও মানুষের এই মনোভাবের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। তবুও বেদান্ত এর বিরূপ মতবাদ পোষণ করে। মানুষের এই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বেদান্ত নিঃস্বার্থপরতার কথা বলে। বেদান্ত মনে করিয়ে দেয় মৈত্রীর সেই বিখ্যাত উক্তি –

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম।"[10]

এই পৃথিবীতে নিজের স্বার্থের পিছনে ছুটে কত মানুষ সুখী হতে পেরেছে তা আমরা জানি না? তবে বেদান্ত সাধকদের মতে "ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা" বাণীকে হৃদয় শোষণ করতে করতে নি:স্বার্থভাবে কারো কি জন্য কিছু করলে তা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর এর সমান শান্তি পাওয়া যায়। বেদান্তের ঋষিদের মতে "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" অর্থাৎ এই জগতের সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। এই পৃথিবীর একটি জড় বস্তুর মধ্যে যেমন ঈশ্বর পরমাণুরূপে বাস করেন তেমনি একটি জীব বা মানুষের মধ্যেও আত্মারূপে তিনি বিরাজ করেন। নিজ স্বার্থে করাও প্রতিটি কাজ যদি অন্যের হিতার্থে সাথে করা যায় তবে বোধহয় এক অনাবিল শান্তি নীড়ে জীবন বিরাজ করতে পারে- এই হল বেদান্তের এক শ্রেষ্ঠ অনুভুতি।

অহংকার ও বেদান্তসাধনা:

---

[8] কঠোপনিষদ্-১/৩/১৪

[9] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ১৭১

[10] বৃঃ উঃ - ৪/৫/৪

আজ মানবমনে অহংকারের নিত্য আনাগোনা। অহংকার হতাশাকে প্রতিনিয়ত আহ্বান জানায়। আমিত্ব ভাবই হল অহংকার। জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি অথবা দেহের প্রতি মোহ থেকেই অহংকারের জন্ম হয়। তবে আসক্তি পূরণে মোহের মৃত্যু হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনার দ্বারা কামনা বাড়তে থাকে- "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।"[11] আবার কেও কেও দেহকেই চেতন মনে করে অহংকারে ডুবে থাকে। এই অহংকার থেকে দম্ভ তৈরি হয়। দম্ভের অধিকারী হয়েও যখন সে কামনা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন তার জীবনে চরম হতাশা নেমে আসে। বৈদান্তিক সাধনায় জীবন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি" অনুভব করে। বৈদান্তিক চেতনা জীবনের মায়াকে ম্লান করে "খাঁচার ভিতর অচিনপাখি"কে উপলব্ধি করায় এবং অন্তরের অহমবোধকে প্রেমে রূপান্তরিত করে।

শংকরাচার্য উপলব্ধি করেছিলেন যে-"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম হতে জীব ও জগতের পৃথক কোনো সত্তা নাই। মায়ার দ্বারা জগত আচ্ছাদিত-এই হল সমগ্র বেদান্তের উচ্চনিনাদ। কিন্তু সাংসারিক মানুষ প্রশ্ন করতে পারেন "বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন।"[12] রূপরসগন্ধভরা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে এক লহমায় মিথ্যে বলি কি করে? আর বাস্তব জগতে যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তাকে খোলা মনে সত্য বলে কি স্বীকার করা যায়? বেদান্ত দার্শনিকেরা নিজেরাই এই সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন তিনটি দশায় মানবজীবন আবর্তিত হয়-ব্যাবহারিক দশা, প্রাতিভাসিক দশা এবং পারমার্থিক দশা। ব্যাবহারিক বা জাগতিক দশায় এই জগত সংসারকে আমরা মিথ্যা বলতে পারি না। প্রতিদিন চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে সবকিছুই সত্য বলে মনে হয়। আমি আমার সামনের চায়ের কাপটিকে যেমন অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি আমি আমার নিজের শরীরকেও অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু বেদান্তের "তত্ত্বমসি"[13] বাক্যের দ্বারা যখন উপলব্ধি হবে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ ও নিত্য বস্তু এবং ব্রহ্মভিন্ন বাকি সবই অসৎ ও অনিত্য। তখন অর্থাৎ পারমার্থিক দশায় অনিত্য বস্তুকে মিথ্যা বলে বলে মনে হবে, কারণ পারমার্থিক অবস্থায় ব্রহ্ম ছাড়া দেহের কোনো মূল্য নেই। একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা আত্মাই নিত্য। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার নিত্যত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন-

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"[14]

সুতরাং, সেই পারমার্থিক অনুভূতিতে নিত্য, শুদ্ধ আত্মাকেই পরম সত্য বলে মনে হবে। এই চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মাই শরীরকে পরিচালনা করে। সুতরাং দেহ নিয়ে অহংকার করে কি হবে? তবে অহংকারের জন্ম মনে নেয়, শরীরে নয়। শরীর অহংকারকে প্রকাশ করে মাত্র। তাই মন থেকে অহংকারকে ত্যাগ করা প্রয়োজন। মন থেকে অহংকার সরানোর জন্য বেদান্তের শম, দম উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান এবং শ্রদ্ধা এই ষটসম্পত্তির উপাসনা প্রয়োজন। বেদান্তের এই ছটি সাধনার দ্বারা মন শান্ত হলে মনে বৈরাগ্যভাব জন্ম নেবে । মনের সেই বৈরাগ্যে সমস্ত অহংকার মুক্তিতে রূপান্তরিত হবে। দার্শনিক কবির ভাষায়-

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"[15]

---

[11] মনুসংহিতা-২/৯৪, পৃষ্ঠা-১০০

[12] চিরদিন, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৭)

[13] ছান্দোগ্য উপনিষদ্-৬/৮/৭

[14] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-২/২২

[15] সঞ্চয়িতা, নৈবেদ্য কাব্যের 'মুক্তি' কবিতা, পৃষ্ঠা-৩২৫

দেহের ও মনের অহংকার ধ্বংস হলে বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হবে। ফলে দেহ এবং মন পরম শান্তি লাভ করবে। এইভাবে জীবনের সমস্ত হতাশা আনন্দে রূপান্তরিত হলে মানুষ অনুভব করবে- "সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"[16]

সময়ের মূল্য ও মনের একাগ্রতায় বেদান্তভাবনা:

আধুনিক জীবনে মানুষের হতাশার আর একটি বিশেষ কারণ হল মনে একাগ্রতার অভাব। সময়ের হাতঘড়িকে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রতিদিন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছুটে চলি। আমরা জীবনের সবকিছুকে একসঙ্গে ভোগ করতে চাই। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা আপন খেয়ালে স্থান পরিবর্তন করে। তাই আমরা সঠিক সময় সঠিক কর্ম করতে ব্যর্থ হয়। যেমন চিকিৎসকেরা সঠিক সময় আমাদের নিদ্রার উপদেশ দেন কিন্তু আমরা তা অবলীলায় অমান্য করি। তাঁরা ঠিক সময় ঠিকঠিক ভোজনের পরামর্শ দেন কিন্তু তাও আমরা পালন করি না। ফলে দেহ মনের ভাঙনে অজানা রোগ বাসা বাঁধে দেহমন্দিরের কোণায় কোণায়। ফলস্বরূপ জীবনের আয়ু অকালমৃত্যুকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে ছাত্রজীবনেও আমরা সময়কে অবলীলায় অতিবাহিত করি। অথচ ছাত্রজীবন অধ্যয়নের উপযুক্ত সময়, উপনিষদ্ ঋষিদের ভাষায়-"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপ:।" কিন্তু ছাত্রজীবনে অমূল্য সময় নষ্ট করে আমরা ভবিষ্যতকে বিপদের মুখে এগিয়ে দিই। ছাত্রাবস্থায় অকারণে মনকে বিপথে নিয়োজিত করে আমরা জীবনের মূল্যবান সময়কে কলুষিত করি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হতাশা ছাত্রজীবনের অন্যতম সঙ্গী হয়ে ওঠে। সময়কে যদি জীবনের সমান্তরালে বয়ে নিয়ে যেতে না পারি, তবে-"সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয় কি কাজ করেছি আর কি কথা ভেবেছি।"[17]

বৈদান্তিক উপলব্ধিতে জীবনের এই হতাশা দূর করা সম্ভব। তেত্রিশ কোটি দেবতারা হলেন বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মের অন্যতম প্রতীক। সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য অন্যতম। আদিত্য শব্দের অর্থ হল সূর্য, যা সময়কে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দ্বাদশ আদিত্যই বারো মাসের বোধক। সুতরাং দ্বাদশ আদিত্যকে শ্রদ্ধা করার মধ্য দিয়ে যদি আমরা সময়কে সম্মান করতে পারি অথবা সঠিক সময় সঠিক কর্ম করতে পারি, তাহলে গৃহস্থ এবং ছাত্রসমাজের মন থেকে হতাশা চিরতরে বিদায় নেবে।

কিন্তু মনকে স্থির করতে না পারলে আমরা সময়ের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। আর তা না হলে মনের একাগ্রতা আসবে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের রণাঙ্গনে দ্বিধাগ্রস্থ অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছিলেন, হে সখা, আমার এই ধনুকের তীর দ্বারা আমি বায়ুদেবকে পর্যন্ত স্থির করে দিতে পারি। কিন্তু মনকে স্থির করতে পারছি না। আমার মন খুব চঞ্চল-

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুস্করম্।"[18]

আমরা যখন যে কাজটি করব তখন সম্পূর্ণ মনসংযোগ দিয়ে যদি করতে পারি তাহলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে মন শান্তভাবে অবস্থান করবে। নেপোলিয়নের ভাষায় বলা যায়, আমার মনের অনেকগুলো Drawer আছে। আমি যখন রাজকার্য করি তখন মনের সেই Drawer খুলে রাখি আর তখন বাকি Drawer বন্ধ করে রাখি। আবার যখন রাজকার্য ছেড়ে একান্তে অন্দরমহলে সময় অতিবাহিত করি তখন অন্য Drawer বন্ধ রাখি। এই হল মনসংযোগের গোপনসূত্র।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা যখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি তখন মনঃসংযোগ দিয়ে কাজটি করব এটা ঠিকই কিন্তু যখন অন্য কাজ করছি তখন সম্পূর্ণ মনসংযোগের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায়, আমরা যদি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিও সম্পূর্ণ মনসংযোগ দিয়ে করতে পারি, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার সময় সেই মনসংযোগ সমান্তরালভাবে সংস্কাররূপে উদ্ভব হবে, ফলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। স্বামীজির এক শিষ্য শরৎচন্দ্র একদিন স্বামীজির ঘরে গিয়ে বইয়ের আলমারিতে অনেকগুলি Encyclopedia দেখতে পেলেন। শরৎচন্দ্র স্বামীজিকে প্রশ্ন

---

[16] গীতাঞ্জলি -১ সংখ্যক কবিতা

[17] জীবনানন্দ দাশ, 'সময়ের কাছে'

[18] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৬/৩৪

করলেন-একজন মানুষের পক্ষে একজীবনে এতো বই পড়া কি সম্ভব? স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ, সম্ভব। তুমি আমাকে এই নয়টি খন্ড থেকে প্রশ্ন করো। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, স্বামীজি কমা, পূর্ণচ্ছেদসহ উত্তর দিলেন। একই ঘটনা মিরাটেও এক গ্রন্থাগারিক এর সঙ্গে ঘটেছিল। এই হল মনসংযোগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

মনকে স্থির করার আর একটি উপায় হল ইন্দ্রিয়সংযম। বিষয়ের প্রতি অনাসক্তিই হল ইন্দ্রিয়সংযম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন –

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গনীব সর্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"[19]

অর্থাৎ কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বাইরের আবরণের মধ্যে সঙ্কুচিত করে, তেমনই যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাঁর চেতনা চিন্ময়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষধর সর্পের সঙ্গেও তুলনা করা হয়, যারা কোনো নিয়ন্ত্রন ছাড়াই ঘুরতে থাকে। কিন্তু আমাদের দক্ষ সাপুড়ের মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া দরকার, যাতে ঐ সর্পগুলি (ইন্দ্রিয়সমূহ) ছোবল মারতে না পারে।

যাইহোক ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা মনোসংযোগ বৃদ্ধি হলে খুব কম সময়ে জীবনের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে। ফলে মনের একাগ্রতার দ্বারা আমরা সময়কে সম্মান করতে পারব। সময়ের গতিকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারব। তাছাড়া স্থির জলে যেমন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় তেমনি স্থির ও শান্ত মনে জীবনের সুখ অতিস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ধর্মের অজ্ঞানতা ও বেদান্ততত্ত্ব:

আজ বিশ্বায়নের দুনিয়ায় মানুষের হতাশার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল প্রকৃত ধর্মের প্রতি অজ্ঞানতা। বেদান্তমতে নিজেকে উপলব্ধি করায় হল জীবনের বড় ধর্ম। আজকের মানুষ ধর্মের প্রকৃত মর্মকথা অনুধাবনে অক্ষম। আজকের দিনে স্বার্থপরতা হল মানুষের ধর্ম। সবাইকে পিছনে ফেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাই হল ধর্ম। নিজের সুখের সন্ধান করাই হল মানুষের ধর্ম। কেউ বলেন জীবে প্রেম করাই ধর্ম, আবার কেউ বলেন পাথরের মূর্তির কাছে বসে আরাধনা করাকে ধর্ম বলে, কেও আমিষ খাওয়াকে অধর্ম বলেন আবার কেও নিরামিষ খাওয়াকে ধর্ম বলেন। কিন্তু কোথা থেকে এসেছে এই ধর্ম? কোন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে ধর্মের এই সংজ্ঞা ? ধর্মের প্রতি মানুষেরই এই অজ্ঞানতা তাঁদের বিবেকবুদ্ধিকে ভুলপথে পরিচালিত করে। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তৈরি করে। ফলে বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মানুষ প্রতিমুহূর্তে হতাশ হয়ে পরে।

বৈদান্তিক জগতেই মানুষ এই হতাশা দূর করতে পারে। বেদান্ত কোনো বিষয় নয়, বেদান্ত হল জীবনের পরম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিতে স্নান করতে পারলে হৃদয়সমুদ্রে চেতনার মুক্ত মেলে। সেই চেতনা মানুষের বিবেকশক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষ তখন জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিজের বিবেকবোধকে জাগ্রত করতে পারে তখন সে জাগতিক ধর্মের সাথে মিশে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথায় কথা মিশিয়ে বলা যায়-

"জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।"[20]

প্রকৃত ধর্ম মানুষকে সুন্দরের উপাসক করে তোলে। আধুনিক সভ্যতায় ধর্ম বলতে যদি আমরা কর্মকে বুঝি তাহলে সেই ধর্মের উচ্চতর অনুভূতিই হল বেদান্ত। জীবনের প্রতিটি কর্মে বেদান্ত উপলব্ধি করতে পারলে সেটাই হবে পরমধর্ম।

বেদান্ততত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দর্শন আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যাত্রাপথ সেই দর্শনের দ্বারা পরিচালিত। সেই নির্দিষ্ট দর্শনের বাইরে জীবন পরিচালনা করলেই জীবনে হতাশা নেমে আসে।

---

[19] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-২/৫৮

[20] 'গীতাঞ্জলি'-১৬ সংখ্যক কবিতা

আর এই নির্দিষ্ট দর্শনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলে জীবন অনুভব করে-"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে"[21] এই এই চুনি আর পান্নার সৌন্দর্যই জীবনের প্রকৃত ধর্ম। জীবনের এই ধর্ম মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলে। জীবনের এই দর্শনই তাকে শেখায় মূল্যবোধের কথা। জীবনের এই দর্শনের দ্বারাই সে অনুভব করে জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ বলছেন-

> "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়।"[22]

তাই ভগবানস্বরূপ জীবকে ঘৃণা নয়, প্রেম করতে হবে-

> "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[23]

ধর্মের এই আধ্যাত্মিকস্তরের এই অনুভূতিতে মানুষ নিজের মধ্যে অপরকে খুঁজে পায়। উপনিষদের ঋষি বলছেন-

> "যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি।
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুপুপ্সতে।"[24]

তবে ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে হলে মানুষের নিজের বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। একটি গাছ যেমন অঙ্কুর থেকে বিকশিত হতে হতে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়, তেমনি একজন মানুষও বিকশিত হয়ে নিজের জীবনের প্রকৃত ধর্ম অনুভব করে। এবং ধর্মের পথে বৈদান্তিক উন্নতি হলে জীবনের হতাশা দূরে সরিয়ে মানুষ জীবনের প্রকৃত মূল্য অনুভব করে।

আনন্দতত্ত্ব ও বৈদান্তিক চেতনা:

মুঠোফোনের দৌলতে সারা দুনিয়া আজ আমাদের মস্তিষ্কবন্দী। মঙ্গলগ্রহে জলের অনুসন্ধান হোক অথবা চাঁদের মাটিতে রকেট প্রেরণ হোক-সবই বিজ্ঞানের নবজাগরণের প্রতীক। কম্পিউটার স্কিনে চোখ রেখে মনের খোরাক মিটছে প্রতিনিয়ত। প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করেছি আমরা। জীবনের এতো ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও আমরা কি আনন্দে আছি? মনের ভিতর থেকে উত্তর আসবে, না, আমরা আনন্দে নেই। প্রতিমুহূর্তে আমরা জীবনে এক কুচি আনন্দের জন্য হাহাকার করছি। সমাজের একজন ঐশ্বর্যশালী মানুষেরও মনে আনন্দ নেই। এই আনন্দের জন্যই তো একজন সন্ন্যাসী ঘর ছাড়েন, আবার এই আনন্দের জন্যই একজন চোর চুরি করেন। মানুষের এই নিরানন্দের জগত থেকেই হতাশার জন্ম হয়। তবে কি এই নিরানন্দের কারাগার থেকে মুক্তি কোথায়? বৈদান্তিক শিক্ষাই হল জীবনে নিরানন্দ থেকে মুক্তির মূল চাবিকাঠি। বেদান্তের আধ্যাত্মিকস্তরে নিজেকে উন্নীত করতে পারলে জীবনে পরম আনন্দ পাওয়া যায়। জীবনের সৃষ্টি তো আনন্দ থেকেই-

> "আনন্দদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"[25]

আনন্দব্রহ্ম থেকেই যখন জীবনের উৎপত্তি তখন এতো নিরানন্দ আসে কোথা থেকে?

---

[21] 'সঞ্চয়িতা', শ্যামলী কাব্যের 'আমি' কবিতা, পৃষ্ঠা-৫২৬

[22] 'মানুষের ধর্ম', ভূমিকা অংশ।

[23] স্বামীজির বাণী ও রচনা(ষষ্ঠ খণ্ড) পৃষ্ঠা-২১০

[24] ঈশোপনিষদ-৬

[25] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-৩/৬

জীবনের চারটি পুরুষার্থের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু দার্শনিকেরা মোক্ষ বা মুক্তির মধ্যেই পরম আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। তাই যুগে যুগে তাঁরা এই স্তরের সাধনা মত্ত হয়েছেন। ব্যাবহারিক জীবনে আমরা আনন্দ বলতে ইন্দ্রিয়সুখকে বুঝি। আনন্দকে ভোগ করার একটি মাধ্যম হল ইন্দ্রিয়। যেমন, আমরা কেও খাদ্যরসিক, আর কেও ভ্রমণপ্রিয়, আবার কেও দেহের আরামকেই সুখ বলে মনে করি। তবে বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয়সুখ হল ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী সুখ কখনো প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়সুখের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে। আবার বেদান্তদর্শন অনুসারে অনিত্য বস্তুতে আনন্দ পাওয়া যায় না কারণ অনিত্য বস্তু চিরস্থায়ী নয়। আমাদের দেহ হল অনিত্য বস্তু। আমরা যেমন পুরনো কাপড় খুলে নতুন কাপড় পড়ি তেমনি আমাদের দেহও জীর্ণ হলে অন্য দেহ ধারণ করে-

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি ।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"[26]

সুতরাং অনিত্য দেহের দ্বারা বা ইন্দ্রিয় দ্বারা কেও প্রকৃত আনন্দ পায় না। সুতরাং যা নিত্য নয় তার প্রতি মোহ ত্যাগ করা উচিত। অনিত্যের মধ্যে মোহ না রেখে নিত্যের সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলেই "আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে" ।

জীবনে আনন্দ লাভ করার আর একটি উপায় হল প্রতিদিনের কর্মে আনন্দ অন্বেষণ করা। আমরা প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে যদি আনন্দ মেশাতে পারি তাহলে জীবনে হতাশা থাকবে না। আমরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। কেও অধ্যাপক, কেও ডাক্তার আবার কেও কৃষক, কেও বা ছাত্র। একজন অধ্যাপক যদি তার অধ্যাপনার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পান তবে তিনি মনে শান্তি পাবেন। একজন কৃষক যদি কৃষিকাজ আনন্দসহকারে করেন তবেই কৃষক জীবনের হতাশা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবেন। তবে কর্মের মধ্যে আনন্দ পেতে হলে সততার সঙ্গে কর্ম করতে হবে। এইভাবে জীবনের প্রতিটি কর্মের মধ্যে আনন্দ লাভ করতে পারলে আমরা জীবনে শান্তি অনুভব করব। হতাশা জীবন থেকে দূরে সরে যাবে। তবে সকাম কর্মের মধ্যে আমরা আনন্দ খুঁজে পেলেও তার মধ্যে স্বার্থপরতা লুকিয়ে থাকে । ফলে সেই কর্ম থেকে হতাশার চিরমুক্তি হয় না। তাই বেদান্ত সাধকেরা নিষ্কাম কর্মের মধ্যে আনন্দ খুঁজেছেন। যে কর্মে ফলের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার শ্রেষ্ঠ ছাত্র অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন–

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।"[27]

অর্থাৎ কর্মেতেই তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করো। সেই কর্মে কোনো স্বার্থপরতা থাকে না। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কর্ম করবো অথচ কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা থাকবে না- এটা কি করে সম্ভব? বেদান্ত দার্শনিকেরা তত্ত্বটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, বর্তমানে আমরা যে ফল ভোগ করি তা সবই প্রারব্ধকর্মের ফল। প্রারব্ধ কর্ম হল আগের জন্মের কর্ম। আর বর্তমানে আমরা যে সমস্ত কর্ম করছি তার ফলও ভবিষ্যতে পাব। আমরা জানি না আমাদের প্রারব্ধ কর্মে কি ফল সঞ্চিত আছে, তাই ফলের আকাঙ্ক্ষা না করাই ভালো। শ্রীমদ্ভগবদগীতার এই ভাবনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে হৃদয় থেকে স্বার্থপরতা চলে যাবে এবং জীবন "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা" অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

তবে ধর্ম, অর্থ ও কামের আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে। এই তিন প্রকার আনন্দের মধ্যে যে পূণ্য অর্জন হয় তা ক্ষয় হয়, সেই পূণ্য ক্ষয় হলে আবার ইহলোকে ফিরে আসে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে-

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"[28]

---

[26] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-২/২২

[27] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-২/৪

[28] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯/২১

কিন্তু মোক্ষের আনন্দ সীমাহীন, মোক্ষের আনন্দই হল প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করাই হল আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের সকলের অন্তরে সেই শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই হলেন আত্মা। তিনি নিত্য, তার কোনো ধ্বংস নেই। তিনি সদা আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দব্রহ্ম থেকেই পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীব সৃষ্টি হয়েছে-

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"[29]

সুতরাং জীবন আনন্দ স্বরূপ।জীবনের এই আনন্দ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। সেই অজ্ঞান বা মায়াকে জ্ঞানের দ্বারা সরাতেই পরম আনন্দ প্রকাশিত হয়। জীবনের মধ্যেই আনন্দ থাকে, জীবনের বাইরে নয়। ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ব্রহ্ম আছেন সেজে। অথচ আমরা জীবনের বাইরে আনন্দ খুঁজতে যাই। তখনই মায়ার ফাঁদে পড়ে আমরা হতাশ হয়। জীবনের একের মধ্যে যদি আনন্দ খুঁজতে পারি তবে জীবন থেকে হতাশা সরে গিয়ে জীবনের পরম অমৃত লাভ করব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

"খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে।"[30]

প্রশ্ন উঠতে পারে আনন্দ কিভাবে আমাদের আত্মার মধ্যে থাকে? উপনিষদে বলা হয়েছে আনন্দ ব্রহ্মরূপে আমাদের আত্মার মধ্যে থাকে তাই জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। পঞ্চদশীতে বলা হয়েছে-

"ইয়মাত্ম। পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ।
তৎ প্রেমাত্মাধর্ম্যত্র নৈবমষ্টার্থমাত্মনি
অতন্ত পরমন্ডেন পরমানন্দতাত্মনঃ।"[31]

এই জ্ঞানই হল আত্মা, আত্মাই হল পরমানন্দ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার। পরম প্রেমের আধার বলেই আত্মা পরম আনন্দস্বরূপ। যখন আমরা আমাদের ভিতরের আত্মাকেই আনন্দরূপে স্বীকার করতে পারব তখন বাহ্যিক বিষয়ের আনন্দ আমাদের তৃপ্তি দিতে পারবে না। তখন নিষ্কাম কর্মের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা জীবনকে উৎসর্গ করতে পারব। জীবন তখনই সংকেত দেবে-তোমার আনন্দ অন্যের হাতে, আর অন্যের আনন্দ তোমারই মাঝে।

একটি গল্পের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। এক বক্তা বক্তব্য রাখবেন বলে মঞ্চে উঠেছেন। হঠাৎ করে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। তারপর সমস্ত শ্রোতাদের একটি ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই অনেক বায়ুভর্তি বেলুন রাখা ছিল। তিনি প্রত্যেক শ্রোতাকে একটি করে বেলুন তুলে নিয়ে নিজেদের নাম লিখতে বললেন। তারপর বেলুনগুলি ফেলে দিতে বললেন। শ্রোতারা তাই করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি প্রত্যেকের নাম লেখা বেলুনগুলি খুঁজে বের করতে বললেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল। নিজের নাম লেখা বেলুন কেও খুঁজে পেল, আবার কেও পেল না। তারপর সেই বক্তা বললেন যেকোনো নাম লেখা বেলুন হাতে নিন এবং তাতে যার নাম লেখা আছে তাকে ফেরত দিন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হল। তারপর বক্তা বললেন আমি মঞ্চে উঠে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, আপনার নিজের আনন্দ অপরের হাতে আছে এবং অপরের আনন্দ আপনার হাতে। আনন্দের এই উপলব্ধিতে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না। এই প্রকার আনন্দের দ্বারা জীবনের সমস্ত হতাশা ধ্বংস হয়। আমরা জীবনের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করি। সুতরাং ধর্ম অর্থ ও কাম কেও যদি আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বারা আনন্দে রূপান্তর করতে পারি তবেই জীবন 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'-এর অনুভূতির শরিক হবে।

---

[29] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-৩/৬

[30] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচীন ভারতে এক: ধর্ম পৃষ্ঠা-৫৪

[31] পঞ্চদশী-৮,৯

বেদান্তচর্চার ফল:

বৈদান্তিক চিন্তায় আমরা দুই ধরনের ফল লাভ করতে পারি। ১) দার্শনিক ফল এবং ২) ব্যাবহারিক ফল। বেদান্ত অভ্যাস করলে এই জন্মে হোক বা জন্মান্তরে ভগবানপ্রাপ্তি সম্ভব। আর যদি ভগবানপ্রাপ্তি না হয় তবে সাধকের মহাপুরুষদের মতো গতি প্রাপ্তি ঘটে। এই হল বেদান্তচর্চার দার্শনিক ফল। অন্যদিকে বলা যায়, নিরন্তর বেদান্ত অভ্যাস করলে মানুষ জীবনে চলার পথে অফুরন্ত শক্তি পায়। যখন আমাদের জীবন চলার পথে হতাশায় বিপর্যস্ত হয়, তখনই বৈদান্তিক শক্তি আমাদের জীবনকে হতাশা আর হীনমন্যতা থেকে বের করে আনে-"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধোত"[32] বাণীকে উপলব্ধি করতে শেখায়, বৈদান্তিক শক্তির দ্বারা আমাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে, যা আমাদের ভবিষ্যতে চলার পথ প্রশস্ত করে। আমাদের জীবন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে-এই বেদান্তচর্চার ব্যাবহারিক রূপ।

মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে হতাশাগ্রস্ত নয়, সত্য, শিব ও সুন্দর থেকেই জীবন উৎসারিত হয়। তবে জীবনে এতো হতাশা আসে কোথা থেকে? জীবনের প্রতিমুহূর্তের অজ্ঞান, অহংকার এবং হীনমন্যতা থেকেই হতাশার জন্ম হয়। যেকোনো বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানকেই দার্শনিক ভাষায় 'মায়া'[33] বলা হয়। অহংকার হল আমিত্বের ভাব। দার্শনিকের ভাষায়-"অভিমানাত্মিকা অন্ত:করণবৃত্তি: অহংকার:।"[34] আমরা প্রতি সেকেণ্ডে যদি দশটি বাক্য বলি, তো দশটিতেই অহম্‌বোধ মিশেল হয়ে থাকে। এই অহম্‌বোধই হল অহংকার। আর নিজের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি বা যোগ্যতাকে অনুভব না করাই হল হীনমন্যতা। বৈদান্তিক চেতনায় কিভাবে জীবন হতাশার করালগ্রাস থেকে মুক্তি পাবে তা আমার অতিক্ষুদ্র জ্ঞানে আলোকপাত করলাম ।

উপসংহার:

আলোচনার শেষে কলমের শেষ খোঁচা দেওয়ার আগে বলতে পারি যে, মানুষের সমস্ত হতাশার মূল হল তার মনের ইচ্ছে। কিছু পাওয়ার সাফল্য এবং কিছু না পাওয়ার ব্যর্থতাই হল জীবনের পরিচয়। মৃগ যেমন শিকারীকে ছুটিয়ে বেড়ায় তেমনি ইচ্ছেও মানুষকে দিগ্বিদিক ছুটিয়ে বেড়ায়। ইচ্ছে যখন অপূর্ণ থেকে যায়, মানুষের আশা যখন ভেঙে যায়, সেই নিরাশা আর অপূর্ণতা থেকেই হতাশার জন্ম হয়। তবে বৈদান্তিক জ্ঞানের কিরণ মানুষের ইচ্ছের গহ্বরে প্রবেশ করলেই "সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"[35] জীবন হতাশার আগুনে পুড়তে পুড়তে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ণিমার চাঁদেই সবসময় গ্রহণ লাগে, আবার সেই গ্রহণ কেটে গেলে চাঁদ তার নিজস্ব দীপ্তিতে আকাশের বুকে দিব্যি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জীবনও হতাশার পরীক্ষা দিতে দিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুঃখ ও শোকের ছায়া কেটে গেলে জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। এই হল জীবনের নিয়ম। বেদান্ত জীবনের বাইরের কোনো অনুভূতি নয়। বেদান্ত হল মানুষের অন্তরের পরম উপলব্ধি। সময়ের গতিতে জীবনে বেদান্তের আধ্যাত্মিকতার চাকা ঘুরতে থাকে। তবে সময় কখনও মানুষের তৈরি করা পথে চলে না। মানুষকে সময়ের নির্দেশিত পথে চলতে হয় । হতাশার মধ্য দিয়েই বেদান্তকে উপলব্ধি করতে হয়। এই হল জীবনের চরম সত্য উপলব্ধি। তাই জীবনে যখনই হতাশা আসবে, তাকে সময়ের স্রোতে তাকে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়-এই হল বেদান্তের মূল মন্ত্র।

এতো গভীর তত্ত্ব আলোচনার পরে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, আজকের সমাজের মানুষ তার ব্যস্ততাময় জীবনে এবং তার সংগ্রামময় জীবনে উচ্চতর এই আধ্যাত্মিকতত্ত্ব কি উপলব্ধি করতে পারবে? অথবা উপলব্ধি করার

---

[32] কঠোপনিষদ্-১/৩/১৪

[33] 'মায়া' হল বেদান্তদর্শনের একটি পারিভাষিক শব্দ। শংকরাচার্যের মতানুসারে 'মায়া' ঈশ্বরের অনির্বচনীয় শক্তি। শংকর ঈশ্বরকে জাদুকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জাদুকর যেমন তার জাদুশক্তির বলে এক টাকাকে দশ টাকা বানান, ঈশ্বরও তেমনিভাবে তার মায়াশক্তি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন।

[34] বেদান্তসার, সদানন্দযোগীন্দ্র, পৃষ্ঠা-১১৬

[35] 'গীতাঞ্জলি', ৯৪ সংখ্যক কবিতা

পর ব্যাবহারিক জীবনে তা কি প্রয়োগ করতে পারবে? আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রেই লুকিয়ে আছে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে অর্জুন সুস্থ মনযোগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র উপদেশ শ্রবণ করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন- "নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা।" শুধু তাই নয়, ব্যাবহারিক জীবনে সেই তত্ত্ব প্রয়োগও করেছেন। আজ বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা কি অর্জুনের থেকে বেশি উদ্বিগ্ন? নাকি অর্জুনের থেকে বেশি ব্যস্ত? যদি তা না হয় তাহলে আমরাও আমাদের জীবনে গভীর আধ্যাত্বিকতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারব এবং ব্যাবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারব। তবে প্রথমেই আমাদের সুস্থ মানসিকতার প্রয়োজন। সুস্থ মানসিক স্থিতিতে বেদান্ততত্ত্ব আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলবে-এই আশা নিয়েই শেষ করলাম।

তথ্যসূত্র:

1. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৩৫০, পরবর্তী সংস্করণ-১৪১৭।
2. সেন, অতুলচন্দ্র, উপনিষদ্ (অখণ্ড সংস্করণ),হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম খণ্ড প্রকাশ-১৯৭২, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-১৯৭৬, অখণ্ড সংস্করণ-১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ-১৯৮০।
3. জুষ্টানন্দ, স্বামী, অনুদিত, কঠোপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ-২০১১
4. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রকাশকাল (পুনর্মুদ্রণ)-১৪২১
5. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, প্রকাশকাল-১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৩৬৩।
6. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রণীত, ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৬।
7. দাশ, জীবনানন্দ, ধূসর পাণ্ডুলিপি, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রকাশকাল-১৩৬৩
8. বেদান্তবাগীশ কালিবর সম্পাদিত: বেদান্তসার, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
9. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রকাশকাল ১২৯৩, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯
10. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, সুলভ সংস্করণ-১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ-১৪২২, পৃষ্ঠা-২৯৪
11. ধীবর, কৃষ্ণ, সম্পাদিত: বেদান্তসার, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রকাশকা- ২০২১
12. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, (সম্পাদনা), মনুসংহিতা (কুল্লূকভট্টটীকাসহ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল(দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৪১৬
13. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রণীত, মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৮।
14. **ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রণীত, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, পুনর্মুদ্রণ-১৪০১**
15. ঘোষ, জগদীশচন্দ্র (সম্পাদিত), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশকাল- (ত্রিংশতিতম সংস্করণ), ২০০৩
16. বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী, প্রকাশিত, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত (অখণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬-১৯৮৭, ৪১তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫।
17. দাশ, জীবনানন্দ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, গীতাঞ্জলী, কলকাতা, প্রকাশকাল-২০১৫
18. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রকাশকাল-১৪১৫
19. স্বামীজির বাণী ও রচনা, (তৃতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৯৬৪, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ- ২০১২
20. পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য (সম্পাদিত), সাংখ্যকারিকা (বাচস্পতিমিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদীভাষ্যসহ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রকাশকাল- ১৯৮৩